রহমত ঢাকা পৌছে প্রথমে একটা হোটেলে গিয়ে উঠল। ঢাকায় তার একটা প্রেস আছে। তার ছোট ভাই আলামত চালায়। বউ বাচ্চা নিয়ে ছোট্ট একটা বাসায় থাকে। সেখানে গিয়ে ঠেলে উঠে বিরক্ত করতে চায় না রহমত। খবরও দেয় নি। আলামত ব্যাস্ত হয়ে পড়বে।

ভোরবেলা এসে পৌঁছেছে। হোটেল রুমে কিছুক্ষন ঘুমিয়ে নিল রহমত। দুপুরের দিকে একটা গাড়ী ভাড়া করল এক সপ্তাহর জন্য। এই জামালপুর ঢাকা থেকে প্রায় দুই শ' কিলোমিটার দূরে, দক্ষিন পশ্চিমে, খুলনার দিকে। এদিকে রাস্তা ঘাটের এবং ট্রাফিকের যে অবস্থা তাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে। সেখানে থাকার জায়গার কি ব্যবস্থা হবে সে এখনও জানে না। গিয়ে দেখে শুনে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। পথে একটা দোকানে থেমে সে মোবাইল ফোনের জন্য সিম কার্ড কিনে নিল। অচেনা জায়গা। যে উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছে কোন একটা ঝুট ঝামেলা হওয়া অসম্ভব নয়। সে মিজানকে একটা টেক্সট মেসেজ পাঠিয়ে দিল। - জামালপুর যাচ্ছি।

যা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক বেশী সময় লাগল জামালপুর পৌঁছাতে। পথে ফেরী পার হতে হয়েছে। সে ঢাকার মানুষ। এই এলাকা একেবারেই চেনে না। রাস্তায় অসম্ভব ভীড়ও ছিল। রাত নয়টার দিকে মানুষ জনকে জিজ্ঞেস করে শেষ পর্যন্ত যখন পৌঁছাল, চারদিকে নজর বুলিয়েই বিপদ টের পেল সে। এখানে পাকা রাস্তা একটা আছে ঠিকই কিন্তু আর তেমন কোন উন্নয়নের কাজ হয়েছে বলে মনে হল না। কোথাও মোটেল বা হোটেল জাতীয় কিছুই চোখে পড়ল না। বাজারে গিয়ে কিছুক্ষন ঘোরাঘুরি করে কোন লাভ হল না। দোকান পাট যা আছে সব অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। চারদিকে অন্ধকার। এই এলাকায় মানুষেরা বোধহয় সন্ধ্যা হলেই শুতে চলে যায়। আসার পথে একটা ছোট খাট শহর চোখে পড়েছিল। নামটা খেয়াল করে নি। প্রায় দশ কিলোমিটার পেছনে যেতে হবে। কি আর করা? ঘুরল। রাস্তার অবস্থা বেশী সুবিধার না। খাবলা খাবলা পিচ উঠে গেছে। গাড়ী লাফাতে লাফাতে চলছে। আধা ঘন্টা লাগল পৌঁছাতে। কিন্তু কপাল ভালো, সেখানে থাকার একটা জায়গা পাওয়া গেল। দোতলা, আদ্যিকালের দালান, বাইরে থেকে যেমন রঙ চটা, ভেতরেও তেমনি খারাপ অবস্থা। কিন্তু তারপরও রাতে মাথা গোজার যে একটা জায়গা পাওয়া গেছে তাতেই ও খুশী। হোটেলের নাম 'হোটেল রাজা-রাণী'। মালিক নীচ তলাতেই এক দিকে কয়েকটা কামরা নিয়ে থাকে। মাঝবয়েসী, রহমতের চেয়ে কিছু ছোটই হবে। মাথায় চুল বলতে অল্প কয়েক গাছি। কিন্তু সেটাই বার বার হাত দিয়ে আঁচড়ায়। কামরা ভাড়া নেবার সময় রহমত জানতে চাইল, "গাড়ীটা চুরি হয়ে যাবে নাতো ভাই? বিপদে পড়ে যাব।"

হে হে করে হাসল লোকটা। "কিচ্ছু ভাব্বেন না। আমাদের এখানে দারোয়ান আছে। ক'মাস ধরে খুব চুরি চামারী হচ্ছে। আমরা কয় ব্যবসায়ী মিলে রাতে একজন দারোয়ান রেখেছি। সে সারারাত এই রাস্তায় হাঁটা চলা করে। তাকে বলে দিচ্ছি। গাড়িতে কেউ হাত দেবে না। সে খুব ষণ্ডা পান্ডা লোক। পুলিশের সাথেও লাইন ঘাট আছে। সবচেয়ে ভালো হয়, আপনি তার হাতে একশ' টা টাকা গুজে দিন। স্মরণ শক্তিটা ভালো হবে।" আরেক পশলা হাসি।

দারোয়ানকে ডাকা হল। তার নাম দিদার। তার হাতে দুইশ' টাকা ধরিয়ে দিল রহমত। "দিদার, আমি এখানে তিন চার দিন থাকব। যাবার আগে ভালো বখশিশ পাবে।"
দিদার গাট্টা গোট্টা মানুষ, পঁচিশ ত্রিশের বেশী হবে না বয়েস। এক গাল হাসি দিল। "স্যার, কোন চিন্তা করবেন না।"
রহমত তাকে তার মোবাইলের নাম্বার দিল। "কোন রকম সমস্যা হলে আমার মোবাইলে একটা কল দেবে। গাড়ির কিছু হলে অনেক ফ্যাকড়া হবে।"
সে নিজেও দিদারের মোবাইল নাম্বার নিল। হোটেল মালিকের নামটাও জানা গেল। অবিনেশ মুখার্জি। দিদারকে কাজে পাঠিয়ে দিয়ে অবিনেশকে জিজ্ঞেস করল, "ভাই জামালপুরের নাম তো নিশ্চয় শুনেছেন?"
অবিনেশ হাসল। "কেন শুনব না। এই তো দশ বারো কিলোমিটার হবে এখান থেকে। আমার অবশ্য খুব একটা যাওয়া হয় না। জামালপুরের কথা কেন জিজ্ঞস করছেন বলেন তো?"
"জলিল মাতবরের ছেলে আসলাম আলীর সাথে একটু দেখা করা দরকার। ওদেরকে চেনেন?"
"কেন চিনব না? কিন্তু জলিল মাতবরের বাড়ী তো আমিরগঞ্জে, জামালপুরের দু গ্রাম পরেই। তারা তো ওদিকের বিরাট বড় জমিদার। জলিল ভাই অবশ্য অনেক দিন ধরেই অসুস্থ, চলা ফেরা করতে পারেন না। আসলামই সব দেখাশোনা করে এখন। ভালো মানুষ। তার সাথে কি দরকার আপনার?"
"একটু পারিবারিক ব্যাপার। কাল সকালে উঠেই রওনা দেব। আমাকে একটু পথটা ভালো করে বলে দিলে সুবিধা হত।"
সশব্দে হাসল অবিনেশ। "পথ নিয়ে ভাববেন না। জামালপুর বাজারে গিয়ে যে কাউকে জিজ্ঞস করলেই বলে দেবে। জলিল মাতবরকে চেনে না এমন কেউ নেই ওদিকে। তা, কাল আবার ফিরবেন তো, নাকি?"
রহমত তাকে আশ্বস্ত করল। "আপনার হোটেলের কামরা আমি পুরো চারদিনের জন্য নিচ্ছি। ওখানে থাকার কোন ইচ্ছা নেই।"
"ফিরতে দিলে হয়। তারা যে অতিথিপরায়ণ! তা, চারদিনের ভাড়াটা আগাম দিলে ভালো হয়। বোঝেনই তো?"
রহমত তাকে পুরো চারদিনের ভাড়া মিটিয়ে দিল। "আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করি। জামালপুরের মতি আলীকে চিনতেন?"
একটু ভাবল অবিনেশ। "মাছের ব্যবসা করত এক মতি আলী। তার কথাই বলছেন কিনা...? কিন্তু সে এবং তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিল। শুনেছি বিষ খেয়ে। ওদিকে গিয়ে এসব কথা না তুললেই ভালো। সবাই ভালো ভাবে নেয় না। মনে করে অলুক্ষনে। গ্রামের মানুষজন তো। অল্প বেশী কুসংস্কারতো আছেই।"
তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দোতলায় নিজের কামরায় চলে এল রহমত। ছোট্ট কামরা, কোন রকমে একটা ডাবল বেড এবং একটা ডেস্ক ঢোকানো গেছে। কাপড় পালটে বিছানায় যাবার আগে মিজানকে একটা টেক্সট পাঠাল। - *কাল সকালে আসলাম আলীর সাথে দেখা করতে যাব। আমিরগঞ্জে। ভয় ভয় লাগছে।*

মিজান বন্ধুর টেক্সট পেল অফিসে। বেচারা এতো কষ্ট করে এতো দূর গেছে, কিন্তু কোন লাভ হবে কিনা সন্দেহ। বন্ধুর নিরাপত্তা নিয়েই বরং সে বেশী উদবিগ্ন। সে পালটা টেক্সট করল, 'সাবধানে থাকিস। নতুন কিছু জানলে ফোন দিস'।
গত তিন দিনে তার বাসায় সৌভাগ্যবশতঃ কোন অনভিপ্রেত কিছু ঘটে নি। জুলেখা মালেক এবং জিনিয়ার আগমন উপলক্ষ্যে বাসা সাজিয়ে চলেছে, কি খাওয়াবে তার পরিকল্পনা চলছে। ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত কোন খবর আসে নি। কিন্তু জুলেখাকে কিছু বলে নি সে।

মিজান ইতিমধ্যে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সন্ধান পেয়েছে। ডক্টর এলান স্মিথ জুনিয়র তার অফিসের খুব ঘনিষ্ট এক সহকর্মীর বড় ভাই। ভারতীয় খৃষ্টান। ভালো হিন্দী বলে, কিছু বাংলাও বলে। ছোটবেলায় নাকি কলকাতায় কয়েক বছর ছিল। তার বেশ নাম ডাক। এক সন্ধ্যায় সে তার সহকর্মীকে নিয়ে এলানের বাসায় তার সাথে দেখা করতে গেল। সহকর্মীকে নিজের স্ত্রীর কথা সব খুলে বলে নি মিজান। বলেছে সে ডিপ্রেসড। একজন সাইকিট্রিস্টের সাথে দেখা করলে হয়ত উপকার হবে।
রিচমন্ড হিলে এলানের বিশাল বাড়ী। দামী গাড়ী। বোঝাই যায় ভদ্রলোকের প্রাকটিস ভালই চলছে। ছোট ভাইকে বিয়ার ধরিয়ে দিয়ে মিজানকে নিয়ে তার স্টাডিতে চলে এলো এলান। মিজানকে আশ্বস্ত করল, তাদের মধ্যে যা আলাপ হবে সব গোপনীয় থাকবে। মিজান অকপটে সব বলতে পারে। চিন্তার কোন কারণ নেই। মিজান তাকে জুলেখার কর্মকান্ডের কথা খুলে বলল কিন্তু জ্বীন সংক্রান্ত কিছু বলল না। এলান হয়ত তাকে পাগল ভেবে বসবে। তাকে সমস্যাটা জানানো হয়েছে, সমাধান সেই বের করুক। বিস্তারিত শোনার পর এলানকে বিশেষ রকম কৌতূহলী মনে হল। "তোমার স্ত্রীর সাথে আমার দেখা করা দরকার। তাকে আমার অফিসে কবে আনতে পারবে?"
মিজান জুলেখাকে ডাক্তারের অফিসে নিয়ে যেতে অনীহা প্রকাশ করল। জূলেখা যদি কোন ভাবে বুঝতে পারে তাকে মাথার ডাক্তারের কাছে নেয়া হয়েছে, তার কি ধরণের প্রতিক্রিয়া হবে জানাটা দুঃসাধ্য। কিন্তু মিজান কোন ঝুঁকি নিতে চায় না।
এলানকে তার আশংকার কথা জানাতে সে একটু ভেবে বলল, "এক কাজ করা যাক। তোমরা দু' জনে কাল সন্ধ্যায় আমার বাসায় চলে এসো। তোমাদের নেমন্তন্ন। আমার স্ত্রী তার কম্পানীর কাজে ব্রাজিল গেছে। সুতরাং হোস্ট আমি একাই। ডিনারের পর কোন একটা অজুহাতে তুমি ঘন্টা খানেকের জন্য বাইরে চলে যেও। আমি তোমার স্ত্রীর সাথে এই সুযোগে আলাপ শুরু করব। সে কিছুই বুঝতে পারবে না।"
মোক্ষম প্ল্যান। মিজান রাজী হয়ে গেল। বিদায় নেবার আগে সে বিশেষ করে জানতে চাইল, "তুমি নিশ্চিত কোন সমস্যা হবে না? চাঁদনীর কিন্তু অসম্ভব রাগ!"
এলান লম্বা চওড়া মানুষ, পঞ্চাশের মত বয়েস হলেও সে খুব ফিট। সে দৃঢ়তার সাথে মাথা নাড়ল। "ভেব না। আমার চিকিৎসা একবার কাজ শুরু করলে, চাঁদনী ঠান্ডা হয়ে যাবে।"
"আর যদি কাজ না করে?"

"আমার চিকিৎসা আজ পর্যন্ত ব্যার্থ হয় নি।" তাকে নিশ্চিত করেছে এলান।

পরদিন এক বন্ধুর বাসায় তাদের নিমন্ত্রণ আছে শুনে কয়েক মুহূর্ত নীরবে মিজানের দিকে তাকিয়ে থাকল জুলেখা। "নিশ্চয় যাব। আপনার কেমন বন্ধু?"
"আমার সহকর্মী," মিথ্যে বলারই সিদ্ধান্ত নিল মিজান। "ভারতীয়। চমৎকার মানুষ। ওর স্ত্রী থাকবে না কিন্তু সে দারুণ রান্না করে। স্ত্রী এক অফিসের বড় কর্মকর্তা। ট্রিপে গেছে।"
তার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল জুলেখা। কিছু বলল না। নিজের কাজে চলে গেল। মনে মনে উদ্বিগ্ন হলেও বাইরে সেটা বুঝতে দিল না মিজান। কে জানে, হয়ত এলানই এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

পরদিন জামালপুর বাজারে যখন পৌঁছাল রহমত তখন সকাল দশটা বাজে। বাজারে ভীড় তেমন নয়। একটা কাপড়ের দোকানে গিয়ে আসলাম আলীর কথা বলতেই তার বাড়ী যাবার পথ দেখিয়ে দিল তরুণ দোকানী। আসলাম আলী নাকি তার দোকানে মাত্র কয়েক দিন আগেই এসেছিল। পাঞ্জাবী কিনতে। ছেলেটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার নির্দেশনা অনুযায়ী মাটির রাস্তায় গাড়ী নামাল রহমত। রাস্তা মাটির হলেও মোটামুটি সমতল। চলতে হচ্ছে অবশ্য খুব আস্তে। এদিকে আজকাল কিছু ধণী জমিদার এবং ব্যবসায়ীদের নিজস্ব গাড়ী আছে, ফলে এই রাস্তায় গাড়ী চলা দেখতে সবাই অভ্যস্ত মনে হল। কেউ দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল না। তবে গ্রামের মানুষ এমনিতেই একটু কৌতূহলী। ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে না তা নয়। হয়ত বোঝার চেষ্টা করছে, কোন বাড়ীতে যাচ্ছে।
বাজার থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার যাবার পর দোকানীর কথা মত রাস্তার নিকটেই লাল ইটের একটা বড়সড় দালান দেখা গেল, উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। গাড়ী নিয়ে গেটের সামনে চলে এলো রহমত। দারোয়ান আছে। আসলাম আলীর সাথে দেখা করতে এসেছে শুনে দহলিজ ঘরে বসতে বলে আসলামকে ডাকতে গেল সে। গাড়ীওয়ালা অতিথি নিশ্চয় খুব সচারাচর আসে না, কারণ আসলাম দারোয়ানের সাথেই চলে এলো। রহমতকে দেখে অবাক হল। 'আপনাকে তো চিনলাম না!"
বিনয়ের অবতার বনে গেল রহমত। এই লোকটির মুখ থেকে কথা বের করাটা খুব জরুরী। সে সালাম দিয়ে হাত মেলাল। আসলাম বয়েসে পয়ত্রিশের বেশী হবে না। শিক্ষিত, রুচিশীল। কলেজের লেকচারার, কথাবার্তায় সংযত ভাব আছে। "ভাইয়া, আমার নাম রহমত। অনেক দূর থেকে এসেছি আমি। সুদূর কানাডা থেকে। আপনার সাথে একটু নিভৃতে আলাপ করতে চাই।"
কানাডা শুনেই একটু কৌতূহলী মনে হল আসলামকে। "কি নিয়ে বলেন তো?"
রহমত তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, "জুলেখা।"
লোকটা খুব আশ্চর্য হয়েছে মনে হল না। তাকে নিয়ে দোতলা বাড়ির নীচতলার একটা ছোটখাট কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। একটা টেবিলকে ঘিরে কয়েকটা চেয়ার। কাঁচের পাল্লা লাগানো কাঠের আলমারির মধ্যে অনেক বই পত্র। বোঝা গেল এখানে

মাঝে মাঝে ছাত্র ছাত্রী পড়ায় আসলাম। রহমতকে বসতে বলে নিজেও একটা চেয়ারে পিঠ সোজা করে বসল সে। "আমি শুনেছি জুলেখা বিয়ে করে কানাডা গেছে। টরন্টোতে। আপনিই কি তার স্বামী?"

"না। না। আমার বন্ধু মিজান তার স্বামী। আমি তার হয়ে আপনার সাথে কথা বলতে এসেছি।"

"বলেন। শুনছি।"